সীমান্ত কথা - ৩

মখদুম আজম মাশরাফী

গত সংখ্যার পর - - - -

আমার ফুফা ভারতের মাটিতেই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁকে আমি কখনও পাকিস্তানের বা পরে বাংলাদেশের মাটিতে পা ফেলতে দেখিনি বা শুনিনি। পাসপোর্ট ভিসা করে যদিও আমার ফুফু ও তাঁদের ছেলে সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ী অর্থাৎ আমার দাদুর বাড়ী আসতেন মাঝে মধ্যে।

দাদু বেঁচে থাকতে আমাদের পরিবার ছিল একান্নবর্তী। আব্বার ছিল পুলিশ বিভাগের বদলীর চাকরী সারা বাংলা ও বিহার জুড়ে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আম্মা কখনও থাকতেন দাদুর বাড়ী। আবার কখনও আব্বার সাথে সাথে যাযাবর জীবনে। তিনিও স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। অন্যান্য চাচারা পরিবার সহ দাদুর বাড়ীতেই থাকতেন। সে সুপরিসর বাড়ীর মধ্যখানটি ছিল উঠোন। সে উঠোনের চারদিক ঘিরে ছিল প্রতি সন্তানের পরিবারের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ঘর। পরিবারের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গেলে আব্বা ও তার দুই ছোট ভাই উঠে যান দোলা পেরিয়ে অদুরেই নতুন বসতিতে। সেটি হলো এক পুকুর বাগান ঘেরা হিন্দু বাড়ী। দেশ ছাড়ার আগে তারা বিক্রি করে যান। মূল বাড়ী ছিল একটি। প্রায় বার বিঘা মোট জমির বাকি অংশে আরও দুটি বাড়ী গড়ে ওঠে দুই ভাইয়ের জন্য। তার একটি ছিল আব্বার।মূল বাড়ীর একদিকের একটি জীর্ন ইট চুন সুড়কির মোটা ইটের পাঁচিলের ওপারে ছিল রাজকুমার সাহা বাবুর বাড়ী। বেশ বড় এলাকা জুড়ে কারুকার্য্যময় ইটের অনেকগুলি ইমারত মিলে সেই বাড়ীটি। নিজস্ব মন্দির। তারপর বড় সার্বজনীন বিশাল ইন্দারা। ইন্দারার দুই দিকে আরও দুটি জীর্ন ইট সুড়কির মন্দির। চিকনমাটি গ্রামের এই মহল্লাটি সাহাপাড়া। অনেক হিন্দু পরিবারের বাস এখানে। রাজকুমার বাবুর একমাত্র ছেলে শান্তি সাহা। রাজকুমার বাবুর মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হল বাড়ীর ইট খসিয়ে বিক্রির পালা। ক্রমে সব বিলুপ্ত হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে খন্ডে খন্ডে বিক্রি হয়েছিল বাড়ীর সন্মুখভাগ, তারপর উঠান। এ বিলুপ্তির দিকে তাকানো যায় না। যেন সভ্যতার, সমাজের ইট খসে খসে মিশে যাচ্ছে কালের করাল গ্রাসে। শুধু ছায়ার মত চলে ফিরে আছেন যারা তাদের জীবনে ছিল অতীত কালিন ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম ও শান্তি। শান্তিদা'দের পরিবার এভাবেই নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন।

এ পাড়ার ঘন বসতির এক পাশে মাটি থেকে বেশ উঁচু ভীত টিনের চাল-বেড়ার বলাইদা ও কানাইদাদের বাড়ী। তাঁরা এখনও তেমনই আছেন। আমাদের বাড়ীর যে বিরাট পুকুর তার আগের মালিক ছিলেন গঙ্গাধর সাহা ও রেনুবালা সাহা। তাঁদের আমি দেখিনি। তারা তাঁদের জন্মভূমি ছেড়ে পরবাসে গিয়ে কোন বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেছেন কেউ জানে না। এঁদের থেকে যাওয়া বংশীয় পাশের বাড়ীর বাঞ্ছা কাকাদের বাড়ীতে থাকতো ওদের শেষ বংশধর বিশ্বনাথ সাহা আর ওর বোন সোহাগী। এরা আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। শুধুমাত্র আমাদের বাড়ীগুলিতে যাতায়াতের রাস্তার উপরে ঝুঁকে থাকা করবী গাছের ছায়ায় মার্বেল ও লাটিম খেলতাম আমরা। আমাদের খেলায় এসে জুড়তো ব্রাহ্মন বাড়ীর মেয়ে দুলু সর্বজ্ঞ আর বাঞ্ছা কাকার ছেলে ভানু আর ওর বোন মীনা। বিশ্বনাথের মা প্রিয়া বৌদি আমাকে খুব আদর করতেন। স্কুল ফেরার সময় আমাদের জন্য উনি দাঁড়িয়ে থাকতেন দরোজার সামনে শুভ্র শাড়ী পরে। যৌবনকালেই তাঁর স্বামী অপঘাতে মারা গেছেন । চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে তিনি মাথা বের করে ছিলেন। সিগন্যাল পোষ্টের সাথে ধাক্কা লেগে মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই

থেকে বৈধব্যের শুভ্রতায় যৌবনের আগুনকে ঢেকে বউদি বাচ্চাদের শুধু স্নেহময়ী মা হয়ে বেঁচে ছিলেন। পরে শুনেছি চলে গিয়েছিলেন ওপার বাংলায় স্বামীর পরিবার আত্মীয় জনের সাথে যোগ দিতে। বিশ্বনাথ ও সোহাগীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ছোটবেলায় ছবি আঁকতাম। বউদি একদিন একটি গরুর ছবি এঁকে চাইলেন।আমি এঁকে দিয়েছিলাম। তিনি বড়বোনের স্নেহে সেই ছবিটি পূজোঘরে রেখে পুজো করতেন প্রতি প্রভাত ও সাঁঝে। সন্ধ্যায় আযানের পর শঙ্খধ্বনি শুনেই বুঝতাম ধূপের সুগন্ধে, তুলসীতলায় আর পুজোঘওে প্রদীপ জ্বেলে বৌদি প্রার্থনায় মগ্ন।

ভানুর কাছে জানতে পারি ওরা ভারতে আছে তবে কেমন আছে জানিনা। দুলুর একদিন বিয়ে হল। বর তাকে নিয়ে গেল সীমান্তের ওপারে। তারপর আর কিছু জানি না। বড় বোন টুলু, তিনিও স্বামীর সাথে ওপার বাংলায়। বাবন, তাদের বড় ভাইও ওপারে। অথচ তাদের বাবা পন্ডিত মশায়, যিনি আমাদের বাংলা ব্যাকরন পড়াতেন, তিনি ছেড়ে যাননি এদেশ। তাই তাঁর চিতা ভস্ম মিশে আছে এদেশের ধুলো জলে।

গঙ্গাধর আর রেনুবালা সাহার যে পুকুর এখন আমাদের সে পুকুরটি আমাদের বাড়ীর বহিরাঙ্গনের পরেই। আব্বা পুকুরের ওপারে বাঁশের মাচায়, বাঁশের বেড়া আর বাঁশের চালের একটি সৌখিন বৈঠকঘর বানিয়েছিলেন। তার অবসর জীবনের প্রকৃতি সান্নিধ্যের এটি ছিল মন-মন্দির। আমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ঢাকা কলেজের একাকী অথচ নাগরিক জীবন ছেড়ে, এই ঘরে বসে পড়াশুনা করতাম ফজর নামাজ পড়ে ভোরবেলা থেকে প্রায় সারাদিন। পুকুরের ওপারের সীমানায় ছিল কান্‌জিলাল বাবুদের বাড়ী। মধুদা ও ছানুদা দুই আলাদা মায়ের পেটের ভাই। কানজিলাল বাবুর ছোট স্ত্রী ছিলেন কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। তিনি ভোরে স্নান সেরে আমাদের বাগানে ফুল নিতে আসতেন। তাঁদের বড় ছেলে সত্য কান্‌জিলাল ছিলেন আব্বার বন্ধু। অন্যান্য ভাইসহ তিনি তখন কলকাতায় । মধুদার মা পুকুরের ওপার থেকে চীৎকার করে আব্বাকে বলতেন " মোশারফ, তোমার ছেলে পড়তে পড়তে পাগল হয়ে যাবে।" আমরা সবাই হাসতাম। মধুদা আসতেন আমাদের পোয়ালপুঞ্জ থেকে তাদের গাভীর জন্য খড় নিতে। এসে বসতেন মুখোমুখি চেয়ারে। বলতেন 'কি এত পড়ছিস তুতুল?' কথা হতো অনেক। আম্মা চা, পিঠা, মুড়ি, চিড়া, মুড়কি, ছাতু এ ধরনের কোন না কোন কিছু হাতে শুভ্রকেশ, সৌম্য হাসি মুখ নিয়ে হাজির হতেন। মধুদা ফিরে এলেন যুদ্ধের পরে ওপার থেকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ফিরে এলেন যে? আপনার ভাইরা তো কলকাতায় বেশ প্রতিষ্ঠিত। শুনেছি ওদের কেউ ব্যরিষ্টার ?' মধুদা হেঁসে বলতেন, 'ওরা নয় রে তুতুল, তুই আমার ভাই। একদিন শরনার্থী শিবির থেকে ওদের বাড়ী গেছি দেখা করতে। বৌদি এসে কি বললেন জানিস? মধু তুইতো খেয়ে এসেছিস, ওখানে বস, আমরা খেয়ে নিই, একসঙ্গে বেরুনো যাবে।"

ছেলেবেলায় জেনেছি আমার মাতৃভূমির বিভক্তির ইতিবৃত্ত আর তার সাথে জড়িত বিশাল দেশের মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুখ, আবেগ-বেদনার কত কথা। সীমান্ত পেরুনোর নেশায় মা বাবা কখনও আমাকে শেকল পরান নি। শৈশব, কৈশোরের নানা ব্যস্ততার মধ্যেও অজানা ওপার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে বারংবার। পাশের থানা হলদি বাড়ীতে আছে এক সাধক হুজুরের মাজার। প্রতি বছর ওরশ হলে হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে সেই আধ্যাত্মিক সাধকের মাজারে যেতো। সে উপলক্ষে মেলা বসতো। ঐ সময়টুকুতে সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতে ছিল

কিছুটা শিথিলতা। আমার চাচাতো ভাই বজুদা আর আমি খেয়াল হলেই ট্রেনে চেপে চলে যেতাম চিলাহাটি। তারপর পায়ে হেটে মেঠোপথে ওপারের দেওয়ানগঞ্জের হাট। সেখান থেকে রিক্সা বা বাসে করে হলদিবাড়ী ফুপুর বাড়ী মাত্র ৫ কিলোমিটার দুরে। হলদিবাড়ী থেকে প্রধানপাড়া কাঁচা রাস্তা ধরে তিন কিলোমিটার দুরে । এখানেই ফুপুর আসল গৃহস্থ বাড়ী। হলদিবাড়ী হল থানা শহরে বাসাবাড়ী শুধু। ফুপাতো ভাই বোনেরা ছিল বেশ ক'জন। মানিকদা, বাবলা, জুয়েল, গিনি আপা, তানী আপা, বানী আপা, বাবলি, পিপলি, সমাপ্তি। সবাই মজা করে যেতাম মেলায়। ফুপুআম্মা অনেক খাতির যত্ন করতেন। নানান রকমের পিঠা আর রান্নার আয়োজন করতেন। পুকুর ভরা মাছ আর বাড়ী ভর্তি হাস মুরগি ছিল।

ফুপুর বাড়ীতে একবার একটি বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। একজন মধ্যবয়স্ক ধুতিপরা মানুষকে সাইকেলে চেপে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে দৌড়ে এসে ফুপু আম্মাকে বলেছিলাম,' ফুপু আম্মা একজন হিন্দু ভদ্রলোক বাড়ীতে ঢুকলেন।' ফুপু আম্মা খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাবা, ওটাই তোর ফুপু, সালাম কর।' আমি বেশ অবাক, লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। পরে মনে পড়েছিল, কি বোকামীটাই না করেছিলাম। আমার দাদুর একটি ছবি আছে দাদুর মামাতো ভাইয়ের ছেলেদের ঘরের দেয়ালে। যেখানে দাদু ফেজ টুপি, শেরওয়ানী আর কাঁচা করে ধুতি পরা দীর্ঘ দেহ শালপ্রাংশু মানুষ। আমাদের বাড়ীতেও আব্বা ও তাঁর চাচাতো ভাইদের গ্রুপ ছবিতে সবাই লম্বা শার্ট ও ধুতি পরা। আসলে ধুতি হল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর বাবুয়ানা পোষাক। সুন্দর এবং সৌখিন, কিন্তু কোন অজানা কারনে রাজনীতির পঙ্কিল ভাবনায় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ধুতিকে আমরা বলেছি হিন্দুর পোষাক। নিজের জিনিষকে অন্যের বলে চালিয়ে দেয়ার এমন অবাক উদাহরন অনেক আছে সে কথা পরে বলা যাবে।

যাহোক, হলদিবাড়ী হুজুরের মেলা বসতো বেশ ঘন করে। গ্রাম বাংলার আবহমান জীবন প্রবাহের অঙ্গ হল মেলা। ওরশ হল পূণ্যময় পুরুষের মহিমার প্রতি অবনত শ্রদ্ধার আয়োজন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষের মন একইভাবে সমর্পিত ও সুন্দর যেখানে। সীমান্ত সেখানে পরাজিত। উহ্য সাময়িকের জন্যে হলেও। তারপর কতবার গেছি সীমান্ত পেরিয়ে। তবে পাসপোর্ট ভিসা করে নয়। শুধু আজন্মের কৌতুহল আর অন্যায় নিষেধ না মানার অভিযাত্রিক মানসিকতা থেকে। আর হিমালয় কন্যা বাংলার উত্তরের উপত্যকায় প্রকৃতির অপূর্ব রূপ-লালিত্য, সৌন্দর্য্য সুধা পান করার লাগামহীন পিপাসা থেকে। সে বেশ মজার মজার অভিযানগুলি। কোন কোনদিন এক কাপড়ে চেপে বসতাম সীমান্তগামী রেলে। ষ্টেশনের পাশেই বাজারের ওপর আমাদের বাড়ী। আম্মাকে খবর পাঠাতাম চলেছি ওপারে ফুপুর বাড়ী। ওপারে পৌঁছে যেতাম অনায়াসেই। কারণ আমার ফুপুতো ভাই মানিকদা খুব মিশুক ছেলে। ও গান গাইতো হারমোনিয়াম বাজিয়ে। গানের প্রতি ওর ছিল স্বতস্ফূর্ত নেশা। সীমান্তের ভারতীয় রক্ষীদের সাথে তার ছিল খুব ঘনিষ্টতা। ফুপা ছিলেন সে ইউনিয়নের পঞ্চায়েত। সবাই মানতো। বাবলা আর আমি প্রায় সমবয়সী। দু-জন চলে যেতাম জলপাইগুড়ি। সিনেমা দেখতাম। হিন্দি ছবি। তখন ভারতীয় ছবির আনাগোনা নিষিদ্ধ ছিল এপারে। মনে আছে দেখেছিলাম নবীন নিশ্চল আর রেখার 'শাওয়ান ভাদো', রাজেশ খান্না আর ডিম্পল কাপাডিয়ার– 'হাথি মেরা সাথি'। অমিতাভের 'মুকাদ্দর কা সিকান্দর'। আমজাদ খানের 'লোক-পরলোক'। সিনেমা হলের পাশের রেষ্টুরেন্টে ছবি ভাঙ্গলে খেতাম মুঘলাই পরটা।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)